দৈনিক জনকণ্ঠ

২

তারিখ ... ... JAN 03 2000 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

হাজার বছর আগে

ইউরোপ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন আর এশিয়া আলোকিত

মোয়াজ্জেম হোসেন

সময়টা পিছিয়ে দেয়া যাক এক সহস্রাব্দ। ঘুরে আসা যাক ৯৯৯ সালের পৃথিবী। কেমন ছিল তখনকার মানুষ, তাদের জীবন? গত এক হাজার বছরের ব্যবধানে যে বিপুল ও বিস্ময়কর পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তাতে ৯৯৯ সালের বিশ্বকে চেনাই মুশকিল হবে।

আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান ইউরোপ থেকে শুরু করা যাক। ৯৯৯ সালে ইউরোপ এক তমাচ্ছন্ন মহাদেশ। দুর্বিষহ জীবন সেখানে সাধারণ মানুষের। নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গাদাগাদি করে থাকে মানুষ, এক বেলার আহার যোগাড় করার জন্য খাটতে হয় উদয়াস্ত। জীবন তাদের অতি সংক্ষিপ্ত, গড় আয়ু মাত্র ৩০ বছর। এমনকি সমাজের যারা হর্তা-কর্তা ছিল তাদের জীবনও এর চেয়ে উন্নত ছিল না। ইউরোপীয়দের তখনও পর্যন্ত ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার কোন বালাই ছিল না, গোসল করত মাসে-দু'মাসে একবার, গা দিয়ে বেরুত বোঁটকা গন্ধ। আজকের ইউরোপের অত্যুজ্জ্বল বিশাল মহানগরীগুলোর কোন অস্তিত্বই তখন ছিল না। বেশির ভাগ লোক তাদের বাড়িঘর থেকে দূরে কোথাও যায়নি, যাবার প্রয়োজনও তাদের ছিল না। পথঘাট তখনও তৈরি হয়নি, রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আগের যুগের রাস্তাঘাটও বিনষ্ট হয়েছে। চার্চ তখন অসীম ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান, সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ড ধর্মের কঠিন-কঠোর নিয়মকানুনে বাঁধা।

এবার ঘুরে দেখা যাক এশিয়া। ৯৯৯ সালের এশিয়া এক আলোকিত মহাদেশ। বিস্ময়কর সব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে এশিয়ায়। গড়ে উঠেছে বিশাল বিশাল নগরী। হাজার হাজার মাইল জুড়ে বিস্তৃত এশিয়ার বিভিন্ন সাম্রাজ্য। অর্থে-বিত্তে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শক্তিতে-শৌর্যে এশিয়ার সমকক্ষ তখন কেউ নেয়, ইউরোপ তার কয়েক শতাব্দী পিছনে পড়ে আছে।

আসলে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপের যে দুর্গতি শুরু হয় তা অব্যাহত ছিল পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত। ৯৯৯ সালের ইউরোপ ভীষণ পশ্চাৎপদ, হতদরিদ্র এবং গ্রাম্য। স্কান্ডিনেভিয়া থেকে গ্রীস পর্যন্ত তখন বাস করে ৭ কোটি মানুষ, আজকের জার্মানির জনসংখ্যার চেয়েও যা অনেক কম। এদের ৯০ শতাংশই বাস করত জমিতে। মাত্র ১০ থেকে ২০ হাজার লোক বাস করলে তাকে গণ্য করা হতো বৃহৎ নগরী বলে। ইউরোপের বেশির ভাগ লোক তখন বাস করে নেদারল্যান্ড থেকে ফ্রান্স হয়ে ইতালি পর্যন্ত এলাকায়। ৯৯৯ সালের ইউরোপে যাতায়াত ছিল ভীষণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মানচিত্র সম্পর্কে তখনও অধিকাংশ ইউরোপীয়ের কোন ধারণা নেই এবং রোমান আমলের নির্ভরযোগ্য রুটগুলো তখন ধ্বংস হয়ে গেছে। ইউরোপের বেশিরভাগ লোক সে সময় তাদের বাড়িঘর থেকে দূরে কোথাও যেত না, কারণ যাবার প্রয়োজন তাদের ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ভাইকিংরা। আধ পেটা খাওয়া ক্ষুধার্ত ভাইকিংরা প্রায় তিন শতাব্দী ধরে উত্তর ইউরোপে তাদের হামলা ও লুটতরাজ চালিয়ে যায়। আজকের ইউরোপীয় জাতিগুলোর কোনটিই তখনও পর্যন্ত দানা বেঁধে ওঠেনি। ইউরোপ তখন নানা ধরনের রাজা ও সামন্তশাসিত এক মহাদেশ, খ্রীস্ট ধর্মের বিপুল প্রভাব যাকে এক করে রেখেছে। সে সময় ইউরোপের প্রতিটি শিক্ষিত লোক হয় যাজক নয়তো সন্ন্যাসী। এর বাইরে লেখাপড়া জানা লোক ছিলই না বলতে গেলে। এমনকি জার্মানির 'অটো দি গ্রেট' (৯১২-৯৭৩) এর মতো ক্ষমতাধর সম্রাটও পড়তে পারত কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথম শতকে একজন ইউরোপীয় মানুষের গড় আয়ু ছিল মাত্র ৩০ বছর। শিশু মৃত্যুর হার ছিল ৪০ শতাংশ। কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পদার্পণ করতে পারলে একজন পুরুষ ৪৭ বছর পর্যন্ত বাঁচার আশা করতে পারত। একজন মহিলার ক্ষেত্রে এই বয়স ছিল আরও কম, মাত্র ৪৪ বছর। বেশিরভাগ শিশুর সৌভাগ্য হতো না তাদের পিতামহ বা পিতামহীকে দেখার।

সামাজিক শ্রেণী বিভাগ

একজন বিশপের ভাষায়- সমাজে তখন তিন শ্রেণীর মানুষ ছিল : যারা প্রার্থনা করে, যারা যুদ্ধ করে এবং যারা পরিশ্রম করে।

সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল কৃষক। এরা বাস করত গ্রামে। একটা গ্রামে বড়জোর থাকত ৭৫ থেকে ২৫০ লোক। ব্যবসায়ী ও কারিগর শ্রেণী- যারা হবে ভবিষ্যতে বিভিন্ন নগরীর বাসিন্দা, তাদের তখন সবেমাত্র উদ্ভব ঘটতে শুরু করেছে। দাস প্রথা তখন ঈষৎ পরিবর্তিত হয়েছে, ভূমি দাসরা তখন কিছুটা সম্পত্তি রাখার অধিকার অর্জন করেছে। কিন্তু দাস প্রথা তখনও সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে টিকে আছে, রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও বিলুপ্তি ঘটেনি দাস প্রথার।

তখন একজন কৃষক এবং তার পরিবারের সদস্যদের সাধারণত এক কক্ষের একটি বাড়িতে থাকতে হতো। মধ্যযুগের কঙ্কাল পরীক্ষা করে জানা গেছে গড়ে একজন মহিলার সন্তান সংখ্যা ছিল ৪ দশমিক ২ জন।

খাদ্য, মহার্ঘ্য খাদ্য!

প্রধান খাদ্য ছিল নানা ধরনের শস্য, যেমন গম, বার্লি, রাই ইত্যাদি। শাকসবজির মধ্যে ছিল গাজর, মূলা, বাঁধা কপি, কুমড়া এবং নানা রকম ফল। ইউরোপে তখনও চিনি আবিষ্কৃত হয়নি। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে একজন সাধারণ মানুষের মাংস খাওয়ার সুযোগ হতো। আজকের দিনে বিশেষজ্ঞরা যে ধরনের খাবার খেতে পরামর্শ দেন তখনকার যুগে বেশিরভাগ মানুষের প্রাত্যহিক মেনু ছিল অনেকটা সেরকম : আঁশযুক্ত এবং কম চর্বিযুক্ত শস্য এবং শাকসবজি। মসলার তখন প্রচণ্ড চাহিদা ছিল। কারণ বাসি মাংসের কটুগন্ধ ও স্বাদ দূর করতে মসলা ছিল কার্যকরী। খাবারের পাত্র হতো সাধারণত কাঠের, সিরামিকের ব্যবহার ছিল বিরল।

কড়া বিয়ার ছিল সর্বসাধারণের পানীয়। মদ ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছিল কিন্তু তা তৈরি করা কষ্টসাধ্য ছিল। তাছাড়া যাজকরা প্রায়শই মদ খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করত।

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা

সমাজের শ্রেণীবিভাগ বোঝা যেত পোশাক দেখে। দ্বাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন পোশাক পরার বাধ্যতামূলক নিয়ম আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবর্তন করা হয়। কৃষকরা কালো বা ধূসর ছাড়া অন্য রঙের পোশাক পরতে পারত না। ৯৯৯ সালে একজন সাধারণ কৃষকের পরিধেয় ছিল হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটা টিউনিক বা ঢিলেঢালা পোশাক এবং পায়ে জড়ানো থাকত কাপড়। উচ্চ শ্রেণীর লোকরা ট্রাউজার পর্বত। অন্তর্বাসের প্রচলন ঘটেনি চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত।

জুতা তৈরি হতো মাত্র এক টুকরা চামড়া থেকে। চামড়া দিয়ে পা মুড়ে চারদিকের প্রান্ত সেলাই করে দেয়া হতো।

সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না। নাইট এবং এরকম উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা চিরুণী ব্যবহার করত। এরা হয়ত নিয়মিত স্নানও করত। ডেনরা (ডেনমার্কের অধিবাসী) সপ্তাহে একবার স্নান করত, তবে সাধারণ ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রে এত ঘন ঘন স্নান করার সুযোগ হতো না। কৃচ্ছ্রের জন্য অনেক মঠ থেকে বছরে ৪/৫ বারের বেশি স্নানের ওপর বিধিনিষেধ ছিল।

বিয়ে

বিয়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল, এমনকি ভূমি দাসদের মধ্যেও। ছেলেরা ১৪ বছর এবং মেয়েরা ১২ বছর হলেই বিয়ে করতে পারত। তবে বিয়ের গড় বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে ছিল ২০ থেকে ২৪ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৪ থেকে ১৬। চর্বিযুক্ত খাবার কম খেত বলে তখনকার মেয়েরা সাধারণত ১৫ বছরে ঋতুবতী হতো। ১২ বছর বয়সে বিবাহ করা সিদ্ধ হলেও মেয়েদের দেরিতে বিয়ে হওয়ার এটি একটি কারণ ছিল। চার্চের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করা যেত, বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতামুক্ত।

'রোমান্স' তখনও ইউরোপীয়দের কাছে এক অজানা শব্দ, অজানা বিষয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা হয়ত ছিল, কিন্তু তাকে কোনভাবেই আজকের যুগে যে অর্থে 'প্রেম' 'রোমান্স' শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় সে পর্যায়ে ফেলা যাবে না। ইউরোপের রোমান্টিক প্রেমের উদ্ভব দ্বাদশ শতকে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে। ব্যভিচার তখনও নিন্দনীয় ছিল। যাজকের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের কারণে এক মহিলাকে পুড়িয়ে মারা এবং যাজকের অর্থদণ্ডের কথা উল্লেখ আছে ইতিহাসে। মহিলাদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম ছিল (প্রতি ১১০ হতে ১২৫ জন পুরুষের জন্য ছিল ১০০ মহিলা) বলে তাদের চাহিদাও বেশি ছিল। ছেলেদের বিয়ের জন্য যৌতুক দিতে হতো।

দৈহিক শ্রম

সব ধরনের কাজই ছিল প্রচণ্ড পরিশ্রম ও কষ্টের। শস্যের উৎপাদন ছিল প্রতিহেক্টরে এখনকার উৎপাদনের এক-দশমাংশ মাত্র। উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণ করতে হতো বীজ হিসাবে, এক-দশমাংশ যেত চার্চে এবং পনেরো শতাংশ যেত ভূস্বামীর গোলায়। যা থাকত তা দিয়ে পরিবারের সদস্যপিছু প্রতিদিন সাড়ে পাঁচ শ' গ্রাম রুটি বছর ভর পাওয়ার নিশ্চয়তা ছিল। পানি চালিত কলে শস্য গুঁড়া করা হতো। বায়ু কলের প্রচলন তখনও হয়নি।

চার্চ ও রাষ্ট্র

৯৯৯ সালে মানুষের পুরো জীবনটাই ছিল অনিশ্চয়তায় ভরা। জীবনকে তখন অর্থপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছিল চার্চ। ইউরোপে চার্চ ছিল সে সময় সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের সবকিছু তখন পরিচালিত হতো চার্চের তৈরি করা বিধান অনুসারে। প্রতিটি মানুষকেই তখন কোন না কোনভাবে চার্চের জন্য খাটতে হতো। বিশপরা তখন সমাজের প্রধান স্তম্ভ, রাজরাজড়াদের সঙ্গে তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতেন। বিশপরা ছিলেন বিপুল ভূসম্পত্তির মালিক। ভূমি দাস ও সাধারণ কৃষকদের এই জমিতে বেগার খাটতে হতো।

রোমের পোপ ছিলেন চার্চের প্রধান। ১০৫৪ সালে পোপের কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে এবং অর্থোডক্স চার্চের উৎপত্তি ঘটে।

দুর্ধর্ষ ভাইকিং

৯৯৯ সালে ইউরোপে ক্রিশ্চিয়ান চার্চ ব্যতীত সবচেয়ে দুর্ধর্ষ শক্তি ছিল ভাইকিংরা। আজকে যে অঞ্চল নরওয়ে, ডেনমার্ক ও সুইডেন নামে পরিচিত, ভাইকিংরা ছিল তার অধিবাসী। এই দুর্ধর্ষ দস্যু ও যোদ্ধারা কয়েক শতাব্দী ধরে দক্ষিণ ইউরোপে লুণ্ঠন চালায়। তবে দ্বিতীয় সহস্রাব্দে এরা বিভিন্ন জায়গায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করে এবং বিভিন্ন বাণিজ্য পথ গড়ে তুলে ইউরোপকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য

রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাংশের ধ্বংসাবশেষ থেকে উত্থান ঘটে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের। বাইজান্টাইন শাসকরা রোমানদের শাসন পদ্ধতি ও আইনই বহাল রাখে তবে তাদের শাসন ব্যবস্থা রোমানদের চেয়ে গ্রীকদের দ্বারাই বেশি প্রভাবিত ছিল। প্রাচীন গ্রীক ভাষা, সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্র সংরক্ষণে বাইজান্টাইনরা বড় ভূমিকা রাখে।

ইসলামী বিশ্ব

৯৯৯ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বিস্তৃত সাম্রাজ্য ও বড় সভ্যতা ছিল ইসলামের অবদান। বাগদাদ ছিল বিশ্ব সভ্যতার কেন্দ্র। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাব ঘটার পর খুব দ্রুত এর বিস্তার ঘটে। কায়রো, কর্ডোভা এবং বাগদাদের খলিফারা ইসলামের পতাকা তলে ছিলেন ঐক্যবদ্ধ। স্পেন থেকে লাহোর পর্যন্ত প্রচলিত ছিল 'দিনার' নামের অভিন্ন স্বর্ণমুদ্রা। ইসলামী সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তখন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য এবং চীনের সুং সাম্রাজ্য।

আরব বিজ্ঞানী ও গবেষকরা তখন জ্ঞানের নানা শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পদার্থবিদ আল হাজেন (৯৬৫-১০৩৯) অপটিকস, দর্পণ ও লেন্স বিষয়ক জ্ঞানের অনেক উৎকর্ষ সাধন করেন। গণিতবিদরা নবম শতাব্দীতে আল খারিজমীর 'অ্যালগরিদম' বিষয়ক কাজ এগিয়ে নেন অনেক দূর। হিন্দু গণিতবিদরা 'শূন্য' ধারণার প্রবর্তক, কিন্তু ইউরোপে তা বহন করে নিয়ে যান আরব গণিতবিদরা।

রোজ কেয়ামত

৯৯৯ সালে কম্পিউটার ছিল না, তাই 'মিলেনিয়াম বাগ'-এর আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু তারপরও এমন আশঙ্কা তখন ব্যক্ত করা হয়েছিল যে ১০০০ সালে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। বাইবেলে বর্ণিত এক কাহিনীর সূত্র ধরে এই আশঙ্কার কথা বলা হয়েছিল। কাহিনীটা ছিল : "দশ শতাব্দী বন্দী থাকার পর শয়তান ছাড়া পেয়ে যাবে ঠিক যেদিন অতিক্রান্ত হবে সহস্র বছর। তারপর শয়তান ছুটে যাবে পৃথিবীর দিকে সব জাতিকে ধ্বংস করার জন্য।" পৃথিবী ধ্বংস হয়নি। টিকে আছে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত। কিন্তু কি হবে ২০০০ সালে? ওয়াইটুকে বিপর্যয় এবং অন্যান্য বিপর্যয়ের আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণ করে পৃথিবী কি টিকে যাবে এবারও?

ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন অবলম্বনে